বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ

জাফর ওয়াজেদ

তথ্যপ্রযুক্তির এই বিকাশকালে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশকালে কেমন হবে বাংলা ভাষার অবস্থা ও অবস্থান, সে নিয়ে সংশ্লিষ্ট কারও ভাষ্য মেলে না। কম্পিউটার, মোবাইল ফোন ব্যবহারে ইংরেজী বা রোমান হরফের আধিক্যে বাংলা ভাষা পিছু হটে যাচ্ছে বলে মনে হতেই পারে। বর্ণমালা না চেনা গ্রামীণ মানুষটিও মোবাইলের বদৌলতে ইংরেজী ভাষাকে জানা শুধু নয়, রীতিমতো অবলীলায় ব্যবহারও করছেন। আবার এক্ষেত্রে যারা বাংলা ভাষা ব্যবহার করেন, তারাও এই ভাষার বিশুদ্ধ রূপটি সম্পর্কে সর্বাত্মক অবহিত নন। তাই বাংলা ভাষায় ভুলের ছড়াছড়ি সবক্ষেত্রেই ক্রমশ বাড়ছে। ভুল বানান, ভুল বাক্য গঠন হরহামেশাই হচ্ছে। বাংলা ভাষার বিশুদ্ধ রূপ যদি পাওয়া যেত, তাহলে ভুল বাংলা লেখার দায়ভার চাপত না কারও ওপর। ভুল বানান আর ভুল শব্দ প্রয়োগের কবল থেকে হওয়া যেত মুক্ত। অবশ্য প্রশ্ন ওঠে সামাজিক মাধ্যমেও যে, বাংলা ভাষার কী কোন বিশুদ্ধ রূপ রয়েছে। যদি থাকে, তাহলে সেটি কী? আর যদি না-ই থাকে, তবে ভুল লেখা নিয়ে আপত্তিই বা কেন? একুশ শতকে এসে দেখা যায়, যে সব বিধি-বিধানের ব্যাপারে বাংলা ভাষা কঠোর, সেগুলোর কোন কোনটিকে মেনে চলার কোন প্রয়োজন অনেকেই বোধ করেন না। বাংলা ভাষার যদি পাওয়া যেত বিশুদ্ধ রূপ, তবে বাংলা বাক্য গঠন ও বানানে যে স্বেচ্ছাচারিতা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়েছে তার প্রতিবিধানে শৃঙ্খলা সৃষ্টির প্রয়োজনে আনুমানিক বিধান যে প্রয়োজন, তা বাংলা ভাষা চর্চাকারীই মাত্র উপলব্ধি করেন। বানানের বিশৃঙ্খলা যেমন কাম্য নয় মোটেও, তেমনি কাম্য নয় শব্দের অশুদ্ধ প্রয়োগ। আর এখন তো এফএম রেডিও আর স্যাটেলাইট টিভির কল্যাণে বাংলা-ইংরেজীর মিশ্রণে জগাখিচুড়ি ভাষার বিশ্রিরকম বিস্তার ঘটছে। বাংলা শব্দের প্রয়োগ বৈচিত্র্য বোঝার ক্ষেত্র যদি না থাকে, তবে শুদ্ধতা দূর পরাহত। বাংলা ভাষা যথাযথ প্রয়োগের ক্ষেত্রে স্বাচ্ছন্দ্য হওয়ার সুযোগ না দিলে সমস্যা বাড়ে বৈকি। বাংলা ভাষা ব্যবহারকারী অর্থাৎ যারা পড়ান বা পড়েন, কিংবা লেখালেখি করেন, তাদের হরেক রকম সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। কখনও তা উচ্চারণের, কখনও ঠিক শব্দ বাছাইয়ের কিংবা যথাযথ বাক্য গঠনের। লেখার ক্ষেত্রে ঝকমারি কম নয়। যতি চিহ্নের ব্যবহার বা সঠিক বানান প্রয়োগ এসবের নিয়ম মানা কিংবা নিয়ম ভাঙার কাজটি করতে হয়। ব্যাকরণের নিয়মে গ্রাহ্য নয়, এমন বহু শব্দ বা বাক্যের প্রয়োগ প্রচলিত, তার অনেকগুলোই ব্যবহার করা হয়েছে। আবার এমন প্রয়োগও দেখা যায়, যা ব্যাপকভাবে প্রচলিত, কিন্তু শুধু সেই কারণেই তাকে মেনে নেয়া যায় না। সুতরাং কোনটি প্রচলন গ্রাহ্য এবং কোনটি প্রচলনগ্রাহ্য নয়, তা নিয়ে লেখকের মতো পাঠককেও মাথা ঘামাতে হয়। ‘বাংলা ভাষা পরিচয়’ গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ তো লিখেছেনই, ‘আমরা লিখি এক আর পড়ি আরেক। অর্থাৎ আমরা লিখি সংস্কৃত ভাষায়, আর ঠিক সেটি পড়ি প্রাকৃত বাংলা ভাষায়।’ বাংলা ভাষার ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্যের কারণে বানান সমস্যা একটা গুরুতর ব্যাপার। আবার বাংলা ভাষার ভান্ডারে যে সব শব্দ আছে, তারা সবাই এক জাতে নয়। অবশ্য প্রায় সব ভাষাতেই তাই। কিন্তু বাংলা ভাষার বিশেষভাবে যা আছে তা হচ্ছে বিভিন্ন জাতের শব্দের অস্তিত্ব। এমনকি জাত অনুসারে অনেক সময়ই তাদের বানানে নিয়মের ভিন্নতা রয়েছে। এক জাতের শব্দ, যেমন তৎসম শব্দ। তার মধ্যেও আছে আবার ব্যাকরণ সিদ্ধভাবেই বানানের বিকল্পের অস্তিত্ব বা অবস্থান। অ-তৎসম যে সব শব্দ আছে, তার মধ্যে বানানের নিয়মের মধ্যে রয়েছে শিথিলতা। ফলে তাতে আছে ব্যতিক্রম ও বিকল্পের অস্তিত্ব। দেখা যায়, বাংলা শব্দের বানানের ক্ষেত্রে একটি ঐক্যবদ্ধ নিয়মে পৌঁছানো সম্ভব নয়। অনেকগুলো নিয়ম, যা কখনও কখনও স্ববিরোধী, তাকেও মেনে নিতে হয়। কেবল প্রচলনের কারণেই বহু তৎসম শব্দে নিয়ম লঙ্ঘন ধীরে ধীরে স্বীকৃত হয়ে গেছে। এ নিয়ে আর আপত্তি মেলে না। বাংলা ভাষা ব্যবহারে কতিপয় বেতার-টিভির বিকৃতি নিয়ে সর্বোচ্চ আদালতও সংক্ষুব্ধ হয়েছিল। এসব পরিহারের জন্য বানানের ক্ষেত্রে নিয়ম চালুর জন্য কবি-সাহিত্যিক- শিক্ষাবিদ-প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের নিয়ে আদালত একটি কমিটিও করে দিয়েছিল। কিন্তু সেই কমিটির কার্যক্রম আর কোন মাধ্যম থেকে জানা যায়নি।

বাংলা ভাষা যারাই সচেতনভাবে ব্যবহার করেন, তাদেরই সর্বাগ্রে প্রয়োজন হয়ে পড়ে বাংলা ব্যবহারের বিদ্যমান সমস্যা সমাধানে এক সঙ্গে কাজে লাগতে পারে এমন একটি অভিধান। যাকে বলা হয় প্রয়োগ অভিধান। অথচ বাংলা ভাষায় প্রয়োগ অভিধান দূরে থাক, একটি পূর্ণাঙ্গ অভিধান বা শব্দকোষ আজও প্রণীত হয়নি। বাংলায় এ যাবতকাল যত অভিধান সংকলিত হয়েছে, তা মূলত ব্যবহারিক অভিধান। আদর্শ তাত্তি¡ক অভিধান রচনার কাজটিও শ্লথ। যেমন হয়নি প্রয়োগ অভিধান প্রণয়ন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ‘বাংলা ভাষাকে চিনতে হবে ভাল করে। কোথায় তার শক্তি, কোথায় তার দুর্বলতা, দুই-ই আমাদের জানা চাই।’ ভাষার অন্তর্নিহিত শক্তির ভেতরে যে ভাষার শক্তি তা তিনি বোঝাতে চেয়েছেন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের কাছে বাংলা ভাষা ‘ভঙ্গিওয়ালাভাষা।’ বলেছেন, ‘ভাব প্রকাশের এ রকম সাহিত্যিক রীতি অন্য কোন ভাষায় আমার জানা নেই।’ বাংলায় বাক্যবিন্যাসও মূলত বিচিত্রমুখী। আর শব্দের

প্রায়োগিক লক্ষ্য অনুযায়ী শব্দার্থের প্রকারভেদও বহুমুখী। বাংলার মতো এতে ইডিয়োমেটিক ইমেজ পৃথিবীর আর কোন ভাষায় নেই। তাই এই ইমেজ ভাষা ব্যবহারকারীর ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন স্বয়ংসম্পূর্ণ পূর্ণাঙ্গ শব্দবোধক অভিধান, যে অভিধান অনুসরণ করে ব্যবহারকারী বা পাঠক শব্দটির যথার্থ প্রয়োগের দিকনির্দেশনামূলক সহায়তা পেতে পারে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় বাংলাভাষার প্রয়োগ ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগের থেকে ভিন্নতর। কেননা, সেখানে ভাষাকে অনেক বেশি শক্তিশালী, দৃঢ় ও অর্থবহ হতে হয়। আবার প্রয়োগের সমস্যা বাক্য গঠনের ক্ষেত্রেও অনেক। এক সময় বাংলা বাক্যে আকাঁড়া সংস্কৃত বা ইংরেজীর প্রভাব পড়েছিল। কিন্তু মুখের ভাষাই ছিল বরাবরের প্রধান নির্ভর। যদিও এর সঙ্গে সংস্কৃত সমাসনির্ভর অন্বয়ের বা ইংরেজী সিনটেক্সের আদল বাঙালীর লেখায়, এমনকি কথোপকথনে মিশে গেছে অনেক আগেই। এবং তা চলিত শিষ্ট; বাংলার একটা আদর্শ বা চাল তৈরি হয়ে গেছে। আর সেটাই এখন বাংলাভাষার গড়ন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেনও 'কথার ভাষার বদল চলছে লেখার ভাষার মাপে। পঞ্চাশ বছর পূর্বে চলতি ভাষায় যেসব কথা ব্যবহার করলে হাসির রোল উঠত, আজ মুখের বাক্যে তাদের চলাফেরা চলছে অনায়াসেই।' বিদেশী শব্দের উচ্চারণ ও বানানরীতি অনুসারে বাংলাভাষায় তা গ্রহণ করতে হবে, নাকি বিদেশী শব্দসমূহকে বাংলাভাষায় উচ্চারণ ও বানানরীতি অনুসারে লিখতে হবে, সে নিয়ে বিতর্ক অনেকদিনের। অথচ বাস্তবতা হচ্ছে, বিদেশী শব্দকে বিদেশী উচ্চারণ ও বানানরীতি মেনে লিখতে হলে বাংলায় নতুন নতুন বর্ণ তৈরি করা আবশ্যক। বাংলাভাষায় বাক্য গঠনে শব্দ প্রয়োগ-অপপ্রয়োগের সীমারেখা জানা না থাকায় নিয়ত ভুল শব্দ, ভুল বাক্যের মুখোমুখি হতে হয়। অন্য ভাষায় যা-ই হোক, বাংলার মতো জীবন্ত ভাষাতে প্রয়োগের সমস্যার ক্ষেত্র অনেক ব্যাপক ও ক্রমবর্ধমান। এমনটা পাই উনিশ শতকেও। ঢাকা নর্মাল স্কুলের পন্ডিত শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত ১৮৬৪ সালে প্রকাশিত প্রথম বাংলা অভিধানের ভূমিকায় লেখা হয়েছিল, 'দিন দিন বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি ও তৎসঙ্গেই বিবিধ নূতন শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে। বাঙ্গালা ভাষায় বিবিধ ভাব প্রকাশক শব্দের অত্যন্ত অভাব আছে। সুতরাং বাঙ্গালা গ্রন্থপ্রণেতা মাত্রেই নূতন নূতন শব্দ প্রণয়ন ও অনেক অব্যবহৃত শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, সেই সমুদয় শব্দের অর্থ প্রায় কোন অভিধানেই পাওয়া যায় না; তন্নিমিত্ত বাঙ্গালা পাঠকগণের নিকট এই ভাষা সময়ে সময়ে এক অভিনব ভাষা বলিয়া প্রতীয়মান হয়; আমি সেই অভাব পরিহারে কৃত সংকল্প হইয়া প্রথমতঃ নানাবিধ বাঙ্গালা পুস্তক পাঠ করিয়া বহুসংখ্যক নূতন শব্দ সংগ্রহ করিয়া ধাতু ও লিঙ্গ সহিত শব্দদীধিত নামে এই অভিধানখানি প্রচারিত করিলাম।' আর বিশ শতকের সূচনা সময় থেকে বাংলাভাষা, সাহিত্যের দ্রুত ঋদ্ধি, সংবাদপত্র সাময়িকপত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি, আইন-আদালতে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্ম, দর্শনের বিতর্ক বিচারে অর্থাৎ বাঙালী জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে বাংলাভাষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয় তীব্রভাবে, ফলে সঙ্গত কারণেই বাংলাভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান চর্চার ক্ষেত্রে সূচিত হয় এক নতুন অধ্যায়। কিন্তু ব্যবহারিক ব্যাকরণ বা ব্যবহারিক অভিধান পূর্ণাঙ্গ রূপ পায়নি অদ্যাবধি।

এটা তো বাস্তবতা যে, সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রূপান্তরিত হয় জীবন্ত ভাষা, জীবনে এবং সাহিত্যে শব্দের অর্থান্তর, অর্থ সঙ্কোচন কিংবা সম্প্রসারণ হয়ে ওঠে অবশ্যাম্ভাবী। ভাষার রীতিতে, বানানে, বাক্য বিন্যাসে, শব্দ যোজনার একাধিক পরিবর্তনে প্রয়োজন হয় নতুন যুগের নতুন অভিধান। ব্যাকরণ ও অভিধান মানবজাতির সকল জীবন্ত ভাষা ও সাহিত্যে অনুগামী হয়। জীবন্ত ভাষার রূপ পরিবর্তনে মৌখিক ভঙ্গির প্রভাব থাকে। এটি ধরা পড়ে বাক্যের অঙ্গ সংগঠনে, শব্দের উচ্চারণে, বানানের রীতি বদলে। তথ্যপ্রযুক্তি তথা বিজ্ঞানের বিপুল অগ্রগতি ও বিকাশ এবং শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার ও বিনিময় এবং সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান ভাষার অঙ্গরূপে আনে অভিনবত্ব এবং এভাবে ভাষার প্রয়োগ বৈচিত্র্য ও ব্যবহার উপযোগিতা বেড়ে যায়। প্রয়োগের পৌনপুনিকতাই অভিধানে ঘুমন্ত শব্দগুলোর জাগ্রত সত্তা ও উপযোগিতা। ব্যবহারিক উপযোগিতাহীন শব্দটির বদ্ধ নিশ্চল মৃত। ব্যবহার না হতে হতে অনেক শব্দ স্মৃতিতেও লুপ্ত হয়ে যায়। গত পাঁচ দশকে আমাদেরই ব্যবহৃত অনেক শব্দ, বাক্য আর উচ্চারিত হয় না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা মুছে বা বদলে গেছে। শিক্ষা, সংবাদপত্র ও গণমাধ্যম এবং সামাজিক মাধ্যমের ব্যাপক প্রসার এবং ভাষা ব্যবহারকারীদের সংখ্যা বাড়ার কারণে ভাষার প্রয়োগ বৈচিত্র্যেরও রয়েছে বহুমাত্রিকতা।

বানানের বিশৃঙ্খলা যেমন কাম্য নয়, তেমনি কাম্য নয় শব্দের অশুদ্ধ প্রয়োগ। প্রয়োগ অভিধানই পারে এই সমস্যার সমাধান দিতে। রবীন্দ্রনাথ তার বাংলাভাষা পরিচয় গ্রন্থে বলেছেন, 'আমাদের দেহের মধ্যে নানা প্রকার শরীর যন্ত্র মিলে বিচিত্র কর্মপ্রণালীর যোগে শক্তি পাচ্ছে প্রাণ সমগ্রভাবে। আমরা তাদের বহন করে চলেছি কিন্তু কিছুই চিন্তা না করে। তাদের কোনো জায়গায় বিকাশ ঘটলে তবেই তার দুঃখবোধে দেহব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ করে চেতনা জেগে ওঠে। আমাদের ভাষাকেও আমরা তেমনি দিবারাত্রি বহন করে নিয়ে চলেছি। শব্দপুঞ্জেও বিশেষ্য বিশেষণে সর্বনামে বচনে লিঙ্গে সন্ধি প্রত্যয়ে এই ভাষা অত্যন্ত বিপুল ও জটিল। অথচ তার কোন ভার নেই আমাদের মনে। বিশেষ কোন চিন্তা নেই। তার নিয়মগুলো কোথাও সঙ্গত কোথাও অসঙ্গত; তা নিয়ে পদে পদে বিচার করে চলতে হয় না। আমাদের প্রাণশক্তি যেমন প্রতিনিয়ত বর্ণে গন্ধে রূপে রসে বোধের জাল বিস্তার করে চলেছে, আমাদের ভাষায় তেমনি সৃষ্টি করেছে কত ছবি কত রসÒ তার ছন্দে, তার শব্দে। কত রকমের জাদুশক্তি।' বাংলাদেশে দেখা যায়, পদ্যের শব্দ গদ্যে যথেচ্ছ

ব্যবহার করা হচ্ছে। ‘সাথে’ আর ‘সঙ্গে’র পার্থক্য যে আছে, তা-ও মানা হয় না। রবীন্দ্রনাথ ‘সবার সাথে যোগে যেথায় বিহারো’ এবং ‘আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ’ কেন লিখেছিলেন, সেটাই স্পষ্ট নয় অনেকের কাছে। ‘অনবরত’ বা ‘অবিরাম’-এর মতো সুন্দর শব্দ থাকা সত্তেi ও ‘লাগাতার’ শব্দ ব্যবহার করা হয় সংবাদপত্রে। আরও দেখা গেছে, বাঙালী চেঁচামেচির ভাষা হিসেবে বাংলার চেয়ে ইংরেজী পছন্দ করে।

বাংলা বানানের ক্ষেত্রেও ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। যুক্তাক্ষরকে ভাঙ্গা, ই, ঈ-কারের সংস্কার সাধন, ‘র’ ফলা, ব ফলা, অনুস্বর বিসর্গ ইত্যাদির ব্যবহার নানা-ভাবে করা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে সম্ভবত প্রয়োজন বাংলা বানানের বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলা দূরীকরণ ও তৎসম, তদ্ভব শব্দের সংস্কার সাধন। ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাকরণের চাপটা একুশ শতকে কিছুটা হলেও কমেছে। বাংলা বানানের ক্ষেত্রেও এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। কম্পিউটার তথা তথ্যপ্রযুক্তির কারণে বানানরীতিতে পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। নানান বিধিও তাই স্বাভাবিক কারণে পরিবর্তিত হবে। বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলা আর রবীন্দ্রনাথের বাংলা কিংবা বিদ্যাসাগরের বাংলা আর শরৎচন্দ্রের বাংলা কিংবা একালে হাসান আজিজুল হক আর হুমায়ূন আহমেদের বাংলা এক নয়। উপন্যাসের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য ভাষা ঠাঁই পেয়েছে। বাংলাভাষা ব্যবহারকারীরা এই একুশ শতকে এসেও সাধু ও চলিতের ফারাক টানায় শ্রমবিমুখ। সাধু-চলিতের গুরুচ-ালী এখনও মেলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে উচ্চ দফতরেও। ‘বাংলা সাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞা’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, ‘বঙ্গভাষা রাজভাষা নহে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা নহে, সম্মান লাভের ভাষা নহে, কেবলমাত্র মাতৃভাষা।’ বাংলাভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে এখন তো ব্যাকরণ ধরাশায়ী। ভাষা ও শব্দ প্রয়োগ অযতŔ লালিত। কোথাও বিশেষণের ভারে জর্জরিত। ষাটের দশকের মাঝামাঝি বাংলা একাডেমির বাংলাভাষা সমীক্ষায় অপপ্রয়োগের আধিক্য দেখে ভাষাবিদ মুনীর চৌধুরী ‘বাংলা গদ্যরীতি’ প্রবন্ধে আক্ষেপ করে বলেছিলেন, ‘যদি উচ্চশিক্ষিত পূর্ব পাকিস্তানীর বাঙলা এত গুরুতর রূপে অশুদ্ধ হয়; তাহলে স্বল্পশিক্ষিতদের লেখা সম্ভবত আদ্যোপান্ত প্রমাদপূর্ণ। ... সমগ্র ভাষার স্বকীয় প্রবণতা আজকের অপটু রচনার আলোকে নিরূপিত হতে পারে না। এমনকি প্রতিষ্ঠিত লেখকের অযতŔ লালিত আঞ্চলিকপুষ্ট, শিরভ্রষ্ট অশুদ্ধ প্রয়োগেও ভাষার পূর্ণ তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্যরূপে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য নয়।’ অনেকক্ষেত্রে অনাবশ্যক শব্দও প্রচলিত হয়ে যায় এবং সেই সঙ্গে নতুন মাত্রা ও দ্যোতনা পায়। বাংলাভাষা ব্যবহারকারীরা এমননিতেই শব্দবাহুল্য পছন্দ করে। কানকে পীড়িত করে এমন শব্দও ব্যবহার হয়। শব্দের ফাঁক ফাঁক বসা আর জড়াজড়ি করে বসার ক্ষেত্রে আছে ভ্রান্তি। একেকজন একেকভাবে ব্যবহার করে। বাংলায় যতিচিহ্ন ঐতিহাসিক ক্রমে ইংরেজীর যতিচিহ্নের অনুসারী। কিন্তু এ ভাষায় যতিচিহ্নের ব্যবহারকালেও অতিনির্দিষ্টতা নেই, ইংরেজীর তুলনায় এমনকি বিরামচিহ্নও বাংলায় সন্ধি বা বাংলায় বিভক্তি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ভেবেছেন। বাংলাভাষায় এদের স্বতন্ত্র ধরন থাকা প্রয়োজন। বাংলাভাষায় সহজিয়া সাধনায় জোয়ার বইছে। টানা বাংলা বেশ কয়েক ছত্র লিখবেন, এমন লেখকের সংখ্যা ক্রমহ্রাসমান। ‘বাংলাভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ’ নামে গত শতকের আশির দশকে বাংলা একাডেমি থেকে বেরিয়েছিল একটি গ্রন্থ। কিন্তু তাকে প্রয়োগ অভিধান বলা যায় না। ভাষার পরিবর্তন ঘটে। বানানেরও কিন্তু তাতেও থাকা দরকার একটি শৃঙ্খলা। বাংলাভাষায় চলছে বিশৃঙ্খল অবস্থা। নির্জীবতার লক্ষণ সর্বত্র। মুদ্রণ নির্ভুল করার সযত্ম প্রয়াস দেখা যায় না। মুদ্রণ প্রমাদ যে রসাপকর্ষ ঘটায় তাতে কোন সন্দেহ নেই। প্রথম শ্রেণীর পত্র-পত্রিকাতে এ বিষয়ে তেমন সতর্কতা দেখা যায় না। মুদ্রণের ঔদাসীন্যের জন্য নর্মদা হয়ে যায় নর্দমা। বাংলা ভাষার ভবিষ্যত নিয়ে উদ্বেগ বাড়বেই। ডিজিটাল দেশে বাংলাভাষা বিপন্ন হয়ে উঠবে, তা কাম্য হতে পারে না। জীবনানন্দ দাশ লিখেছিলেন, ‘মানুষের ভাষা তবু অনুভূতি দেশ থেকে আসে/ না পেলে নিছক ক্রিয়া, বিশেষণ, এলোমেলো নিরাশ্রয়/শব্দের কংকাল।’ বাঙালী বাংলাভাষায় জন্য রক্ত ঢেলেছে। ভাষার জন্য আন্দোলনকে সে স্বাধীনতা আন্দোলন ও যুদ্ধে পরিণত করে ভাষাভিত্তিক নতুন রাষ্ট্র গড়েছে। কিন্তু সেই বাংলাভাষাকে সর্বজনসম্মত ও সর্বজনগ্রাহ্য করে তোলা থেকে ভাষার উন্নয়ন ও বিকাশে কার্যকর উদ্যোগ ও অবদান দৃশ্যমান নয়। একুশ শতকে এসেও শুদ্ধভাবে বাংলা লেখা না গেলে ‘সকলি বৃথা, সকলি গরল ভেল’ যেন।

লেখক: একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক ও মহাপরিচালক প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

#

পআিইডি ফচিার